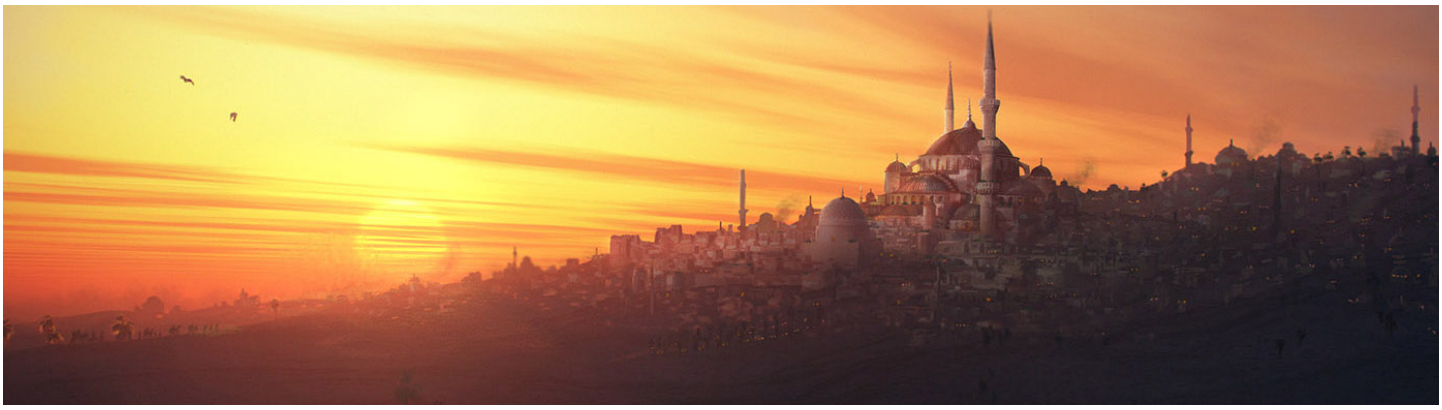

ইকবালের কবিতা

সৈয়দ আলী আহসান

আমাদের সাজাত্যবোধের উন্মেষ ঊনিশ শতকে ইংরাজ অধিকার বিস্তৃত হবার পর। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী সাহিত্য-সাধকদের রচনায় দেশের অব্যবস্থার জন্য বেদনাবোধ ছিলো কিন্তু মুসলমানদের হাত থেকে নিস্কৃতি পেয়েছি বলে কেমন এক ধরণের অমার্জিত সস্তিবোধও ছিলো। রাজা রামমোহন ইউরোপীয়দের নেতৃত্ব মেনেছিলেন এবং তাদের ভারতে বসতি স্থাপন সমর্থন করে একপ্রকার মিশ্রিত জাতির উদ্ভব কল্পনা করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে সমীকরণের কল্পনা হয়েছিলো হিন্দু এবং খৃষ্টানদের মধ্যে। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ হিন্দু সমাজনীতির সংস্কারই ছিলো বিদ্যাসাগরের একমাত্র কাম্য। রঙ্গলাল স্বপ্ন দেখেছিলেন প্রাচীন আর্যসভ্যতার পুনর্জাগরণের-অবশ্য সেই আর্যসভ্যতা যার পুরুষার্থে দীপ্ত হয়ে রাজপুতরা স্বাধীনতার জয়োচ্চারণ করেছিলেন। রঙ্গলালের বক্তব্য হৃদয়াবেগ-রহিত, স্থূল। "স্বদেশীয় বীরদের গৌরবগাঁথা" তিনি গেয়েছেন কিন্তু ঐ পর্যন্তই। জাতীয়তা অথবা স্বাধীনতার অর্থ তিনি, পরিমিত ত নয়ই, সঙ্কীর্ণ পরিসরেও প্রকাশ করেন নি। প্রকৃত প্রস্তাবে বীর রসাশ্রিত কথকতাই তিনি করেছেন, কবিতা রচনা করেন নি। তিনি গল্প বলে উত্তর দিতে চেয়েছেন এ-প্রশ্নের-

কবে পুনঃ বীর রসে,

জগৎ ভরিবে যশে,

ভারত ভাস্বর হবে পুনঃ?

হেমচন্দ্র সঙ্কোচ ও বিহবলতার মধ্যে দিয়ে সাজাত্যবোধের মর্মবাণী বহন করতে চেয়েছেন। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কথা স্মরণ করে আত্মশ্লাঘা আছে, শক্তিমত্ততার বন্দনা আছে। ইংরাজ-অধিকারের স্বীকৃতি আছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরাধীনতাজনিত উদ্যমহীনতার জন্য, হতাশা ও আক্ষেপ আছে। হেমচন্দ্র অধিকারী ইংরাজের কাছেই কল্যাণ যাচ্ঞা করেছেন, অধুনা দুর্বল ও সন্ত্রস্ত ভারতীয়দের জন্য কৃপাভিক্ষা করেছেন। হিন্দু ধর্মাদর্শের পুনর্প্রভাব কামনা করেছেন প্রাচীন আর্য-সাধনার সঙ্গে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মিশ্রণ যাচ্ঞা করে। রাষ্ট্রীয় অধিকারবোধের আভাষ পর্যন্ত নেই কিন্তু সাজাতিকতা এবং হিন্দু ভারতের একীকরণের কথা আছে।

> বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। সর্বপ্রথম বলিষ্ঠভাবে এবং যথেষ্ঠ স্বচ্ছতার সঙ্গে হিন্দু জাতীয়তাবোধের কথা এখানেই বলা হয়। দেশমাতৃকার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং অর্চনার মধ্যে, অনেকটা ধর্মীয় রূপকের সাহায্যেই, হিন্দুর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের জন্য তিনি যে জাতীয় ঐক্যতত্ত্বের সংবাদ আনলেন বাংলা দেশে, তার প্রভাব হল অভূতপূর্ব। জাতি হিসেবে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠা এবং সস্তিলাভের পক্ষে মুসলমানকেই বঙ্কিমচন্দ্র এমমাত্র প্রতিবন্ধক ভেবেছেন। অধিকারী ইংরেজের বিরুদ্ধে কোথাও অভিযোগ নেই। অনুদারতা এবং অসদ্ভাবের এই যে ভিত্তিভূমি রচনা করে হল, আজ পর্যন্তও তা স্থির ও সুদৃঢ় রয়েছ।

উর্দূ কবি হালীর মসদ্দস প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়। হালী ভারতীয় মুসলমানদের কল্যাণের জন্য কুসংস্কার-রহিত যে বিশ্ব

মুসলিম ঐক্যবোধের কথা বল্লেন, তা৷তে মুসলমনদের তৎকালীন বিপর্যয় এবং অশেষ হতাশার জন্যরোনাজারি আছে কিন্তু কোথাও হিন্দুর অকল্যাণ-কামনা নেই। স্যার সৈয়দের সংস্কার ও শিক্ষা আন্দোলনের পশ্চাতে হালীর অনুভূতি সক্রিয় ছিল। নির্জিত-প্রাণ মুসলমানদের জন্য পূর্ব-গৌরবের রুদ্ধ-কবাট প্রথম উন্মোচন করলেন হালী। এ-গৌরবের পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ইউরোপের সে-জ্ঞানভাণ্ডার যা আজ বিশ্ব কর্তৃক স্বীকৃত, নিরলস কর্মপথে আচারের জীবনকে বর্জন এবং বুদ্ধির আলোকদীপ্ত জীবনপথের সন্ধান।

বাংলা দেশের মুসলমানদের কাছে মুসলিম সভ্যতার পুনরুত্থানের কথা অজ্ঞাত ছিলো না। রাজনৈতিক তরঙ্গবিক্ষোভে বাঙ্গালী মুসলমানদের নির্যাতিত মনও কম্পমান হ৷লো। বিহবল মুসলমানদের জাগরণের কথা বল্লেন মীর মুশাররফ হোসেন, মুষাম্মেল হক, ইসমাইল হোসেন শিরাজী ও কায়কোবাদ। এঁদের রচনার পরাধীনতার জন্য তীব্র বেদনাবোধ ছিলো, এবং ইংরাজ তোষণের মতো হীনমন্যতার প্রশ্রয় ছিলো না। শব্দবোধ শ্লথ এবং দুর্বল, কোথাও কোথাও হেম-নবীনের অনুকৃতি মাত্র কিন্তু এর মধ্যেই কেমন একটি অকপট, নিষ্কলঙ্ক মনের পরিচয় আছে, যা৷ আজ্কের দিনে আর পাওয়া যায় না।

ইক্বালের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তারও অনেক পরে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তুর্কীর খেলাফত যখন আর নেই, যখন বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের স্বপ্ন অস্পষ্ট হ৷য়েছে, তখন নজরুল ইস্লাম অতর্কিতে আমাদের প্রাণে উন্মাদনা আন্লেন উদ্ভব-যুগের ইস্লামের কাহিনী স্মরণ ক'রে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্থাবর শান্ত মনে প্রচণ্ড আঘাতে ক৷রে। নজরুল ইস্লামকে পূরোভাগে রেখে বাঙ্গালী মুসলমান যখন আপন জীবনের ভিত্তিহীনতার জন্য অভিযোগ তুল্ছে, তখন ইক্বালের ৷শেকোয়া৷র সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়।

নজরুলকে পথিকৃৎ মেনে আশরাফ আলী খান আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগ আন্লেন আমাদের জীবনের বিপর্যয় ও স্বস্তিহীনতার জন্য এবং সত্যাদর্শের অভাবের জন্যও। ৷শেকোয়া৷য় তিনি আপন মনের অনুরণন শুন্লেন। কাব্য হিসেবে ৷শেকোয়া৷র মূল্য যতই লঘু হোক্ না কেন, এর অভিযোগ আমাদের অনুভূতিতে শিহরণ তুলেছিলো। নজরুলকে ভাল লেগেছিলো, ইকবালকে আরো ভালো লাগ্লো। নজরুলের দীপ্তি অসাধারণ কিন্তু সে দীপ্তির দাহন আছে- স্নিগ্ধতা নেই; ইক্বালের কাব্য জ্বালা আছে কিন্তু ধর্মের স্থির-সত্যের সঙ্গে তার অসদ্ভাব নেই, তাই তা৷ মূলতঃ প্রশান্ত এবং জীবনানুভূতিতে অতুলনীয়।

এর পর যখন তিনি স্পষ্ট ভাষায় হিন্দু থেকে বিশ্লিষ্ট হ৷য়ে ভারতীয় মুসলমানকে অন্য এক জাতীয় ঐক্যতত্ত্বের সন্ধান করতে বল্লেন, তখন তাঁকে আমরা নেতৃপদ দিলাম। ১৯৩০ সালের এলাহাবাদ মুসলিম লীগ অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে ইক্বাল ভারতের দ্বিজাতিতত্ত্বের যে-তথ্য প্রকাশ ক৷রলেন, পরবর্তীকালে তাই হ৷য়ে দাঁড়ালো পাকিস্তান পরিকল্পনার অঙ্কুর। অভিভাষণে ইক্বাল বল্লেন যে, রেন বলেন, মানুষ তার গোত্র বা ধর্মের দাসত্বে আবদ্ধ থাকে না। ভৌগলিক সীমারেখাও তা৷কে বন্ধনদশায় রাখ্তে পারে না। উদারহৃদয়, বিদগ্ধমনা মানুষের সমষ্টি একটি বিশেষ আদর্শ ও বোধের সৃষ্টি ক৷রে থাকে যা৷কে আমরা জাতি ব৷লে আখ্যাত করি। এহেন জাতির সৃষ্টি একেবারে যে অসম্ভব, তা৷ নয়, যদিও এর সম্ভাব্যতার জন্য মানুষের মনকে নতুন ক৷রে সংগঠন ক৷রবার একটি বিলম্বিত প্রক্রিয়ার প্রয়োজন করে। এমন অবস্থা সত্য হ৷তে পারতো, যদি কবীরের শিক্ষা এবং আকবরের বিশ্বাস জনসাধারণের মনকে স্পর্শ ক৷রতো।

কিন্তু অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয় যে, একটি বৃহত্তর পরিবেশে সম্মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা ভারতের কোন ধর্মাবলম্বীই আপন বিশ্বাস ও আদর্শকে অস্বীকার ক৷রতে প্রস্তুত নয়। সম্মিলিত অস্তিত্বের জন্য কারোই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না এবং সেজন্য যে মূল্য দিতে হবে, তা৷ও কেউ দিতে চায় না। ভারতীয় ঐক্যবোধের জন্য প্রয়োজন অনেক আদর্শ এবং জাতির অনস্তিত্বের নয় কিন্তু সে সবার মধ্যে পারস্পরিক বুঝাপড়ার। একমাত্র যুক্তিসঙ্গত এবং বাস্তব পন্থা হচ্ছে, যা৷ নেই তা৷ মেনে নেওয়া নয় কিন্তু প্রচলিত অবস্থাকে স্বীকার করা।

পাকিস্তান পরিকল্পনার উন্মেষ হ৷লো এভাবেই। রাষ্ট্রনৈতিক পরিকল্পনা নয় কিন্তু আদর্শের স্বীকার। সাহিত্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা শুনা যেতে লাগলো আরো পরে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মুস্লিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের পর। বলা হ৷লো প্রকাশ্যেই যে, আমাদের সাহিত্য হবে আলাদা, কেন না আমাদের জীবনবোধ হিন্দুদের সঙ্গে সংসক্ত নয়। কবিতার ক্ষেত্রেই এ-আদর্শের অনুসৃতি হ৷লো সার্থক। পাকিস্তান তখনও পর্যন্ত আবেগ, উল্লাস ও কল্পনার এবং কবিতাই হ৷ল এ-আবেগ প্রকাশের একমাত্র পরিসর। এ-বক্তব্যের সঙ্গে রূপকল্পের সমন্বয় সাধনের পর কখনও কখনও কারো কবিতা শ্রোত্ররসায়নও হ৷য়েছে। কিছুটা অগভীরভাবে হ৷লেও কাব্যক্ষেত্রে তিনটি ধারার চিহ্ন দেখা গেলো- ইস্লামী ঐতিহ্যের কাহিনী ও সৌন্দর্যের ধারা; ইস্লামের সত্য, বিশ্বাস এবং উপলব্ধিগত আদর্শ জীবনবোধ এবং সর্বশেষে পুঁথিসাহিত্য ও পল্লীগীতির রূপ এবং কল্পনার জীবন।

ইক্বালের প্রভাব কার্যকরী হ৷ইয়েছিলো প্রথম দু৷টি ক্ষেত্রে। ইক্বালের প্রভাবে এ-দুটি ধারা বলিষ্ঠ এবং নতুন রূপ নিয়েছিলো-

ক্ষীণ প্রাণধারা স্রোতাবেগ পেয়েছিলো। ষোল শতকের কবি সৈয়দ সুলতান 'জ্ঞান-চৌতিশা'র ইস্‌লামের ধর্ম-তত্ত্ব সম্পর্কে আলোকপাত ক'রেছেন। সতের শতকের কবি আলাওল সুফী-তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন যা'র পরিচয় তাঁর অনুবাদ-গ্রন্থ 'তোহফা'য় বিশেষভাবে পাওয়া যায়। আঠারো শতকের কবি আলী রাজা 'জ্ঞানসাগরে' নিগূঢ় আধ্যাত্মিকতার পরিচয় দিয়েছেন। অর্থাৎ বাংলার কাব্যে ইস্‌লামী আধ্যাত্মিকতার স্ফুরণ এবং বিকাশ বহু আগেই হ'য়েছে। কিন্তু এহেন বিকাশের মধ্যে কেমন যেন স্থূলত্ব ছিলো। ধর্মকে সেখানে নির্মমভাবে জীবনের নিয়ামক করা হ'য়েছে, কিন্তু জীবনের আবেগ ও অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত রাখা হয়নি।

অবশ্য উনিশ শতকের পূর্বের বাংলার কাব্যে আত্মবিশ্লেষণ নেই, হৃদয়াবেগের সঞ্চারণ নেই- তা'র মূল্য কাহিনী-মাহাত্ম্যে, কখনও বস্তু-প্রকৃতি, দেব-বিগ্রহ বা ভগবানের কাছে নিবেদিত চিত্ততায়। যাই হোক্, ঊনিশ শতকের মুসলমান সাহিত্যিক মীর মুশার্‌রফ হোসেনের রচনায় এবং পরবর্তীকালে মুযাম্মেল হক্, কায়কোবাদ, ইস্‌মাইল হোসেন শিরাজীর কাব্যে ইস্‌লামের ইতিহাসের অপরিমিত প্রয়োগ দেখি উপাদান হিসেবে এঁদের রচনায় ইতিহাসের সংবাদ আছে অর্থাৎ ইতিহাসমিশ্রিত জ্ঞানের পরিচয় আছে। যে বস্তুত অভাব মনে হয়, তা হচ্ছে ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহ্যবোধ। অনেক পরে নজরুল ইস্‌লামের কাব্যে ইস্‌লামের ইতিহাস নিছক পটভূমি বা উপাদান নয় কিন্তু অনুভূতির লালনভূমি, সৌন্দর্যের প্রাণকেন্দ্র এবং জীবনের স্বপ্ন ও সম্ভাবনায় পরিণত হয়। নজরুল ইস্‌লামের কাব্যে অভাব ছিলো তওহীদ বা নিঃসংশয় একত্ববাদের, এবং কোরানের ইস্‌লামের সৌন্দর্য ও উপলব্ধির চিত্রের। বিপর্যয়ের জন্য বেদনা এবং বিদ্রোহের অগ্নিবর্ষণ আছে কিন্তু আত্মবিশ্লেষণের অভাবের জন্য গ্লানি ও হতচেতনার সত্যিকারের প্রতিষেধক নির্ণিত হয়নি।

> ইক্‌বাল মুসলমানের নিশ্চেষ্টতা ও হতোদ্যমের যথাযথ চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং এই পতন ও সর্বনাশের জন্য তাঁর ক্ষোভ নিদারুণ। 'জওয়াব-ই-শেকোয়া'য় যে পথ-নির্দেশ আছে, তা'তে ইস্‌লামের চিরশক্তিমত্ততায় বিশ্বাসী ইক্‌বালের নিবিড় উপলব্ধির পরিচয় মেলে। তিনি প্রত্যেক মুসলমানকে অবলম্বন ক'রতে ব'লেছেন, ইসলামের প্রবহমান সত্য এবং কোরানের অমোঘ সঞ্জীবনী বাণীকে। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'In times of crises in their history it is not Muslims that saved Islam, on the contrary, it is Islam that saved Muslims.'- ইতিহাসের সঙ্কট-মুহূর্তে মুসলমান ইস্‌লামের ত্রাণকর্তা হননি, অন্যপক্ষে ইস্‌লামই রক্ষা ক'রেছে মুসলমানকে। অবশ্য মনে রাখ্‌তে হবে যে, ইস্‌লামের অর্থ ইক্‌বালের কাছে স্তিমিত-প্রাণ ব্যক্তির আত্মসমর্পণ নয়; ইসলামের অর্থ শক্তিমত্তা, ন্যায়নুসরণ ও সাধনা একই সঙ্গে।

ইক্‌বালের এই বলিষ্ঠ আবেগ তরুণ মুসলমানের মনকে নাড়া দিয়েছিলো প্রচণ্ডভাবে। সাহিত্যক্ষেত্রে এ-আলোড়নের সংবাদ পাই ১৯৪২-৪৩ সাল থেকে। যাদের অনেকটা পরিহাস ক'রে কাজী আবদুল অদুদ 'আত্মনিয়ন্ত্রণী দল' ব'লেছেন, তাদের উদ্ভব এ-সময়ের দু'টি সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। পূর্ব-পাকিস্তান রেঁনেসা সোসাইটি এবং পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ মুস্‌লিম সাহিত্য-সাধনার পথ-নির্দেশ দিতে চাইল। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের আগ্রহ ও ঐকান্তিকতাই ছিলো এ-আন্দোলনের সজীবতার উৎস। কাব্যক্ষেত্রে নেমে এলাম ফর্‌রুখ আহমদ ও আমি। ইক্‌বালের আদর্শের অনুবর্তী হ'তে চেষ্টা ক'রলেন ফর্‌রুখ আহমদ। তাঁর কাছে পরম মূল্যবান হ'লো উন্মেষ-যুগের ইস্‌লাম। আজ হয় তো বিপর্যয় এবং পরিবেশের সঙ্গে অসদ্ভাব আছে কিন্তু বিশ্বাস ও উপলব্ধির পথে প্রথম যাত্রার উৎসাহ ছিলো অদম্য এবং স্বস্তিও ছিলো প্রগাঢ়। তাই হেরার রাজতোরণই তাঁর লক্ষ্য, যে লক্ষ্যে অগ্রসর হ'তে হ'লে বিশ্ব-মুসলিম ঐক্যবোধ, ইস্‌লামী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা এবং সর্বোপরি খিলাফতের প্রয়োজন। মুজীবুর রহমান অবতীর্ণ হ'লেন স্বতন্ত্র তমদ্দুনের তূর্যবাদক হিসেবে।

ইক্‌বাল বাংলাতে অনূদিত হ'ইয়েছেন দু'টি কারণে। প্রথমতঃ, আমাদের হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে যোগসূত্র নির্ণয়ের জন্য; দ্বিতীয়তঃ ধর্মবোধের পোষকতা ও তত্ত্বজিজ্ঞাসার মীমাংসার জন্য। বাংলাতে তাঁর প্রথম অনূদিত গ্রন্থ 'শেকোয়া'। যে সময় বাঙালী মুসলমান নজরুল ইস্‌লামকে পুরোভাগে রেখে আপন দুঃখদুর্দশার নিবৃত্তি খুঁজ্‌ছে, স্বস্তিহীন মুহূর্তে সে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধেও অভিযোগ এনেছে, তখন ইক্‌বালের 'শেকোয়া'য় সে আপন মনের অনুরণন শুনেছিলো। চরম দারিদ্র্যে নিষ্পিষ্ট, দুঃখ জর্জরিত এবং তৎহেতু আত্মঘাতী কবি আশরাফ আলী খান 'শেকোয়া'র প্রথম তর্জমা ক'রেছিলেন। আশ্চর্য আবেগ এবং গতির মধ্যে আশরাফ আলী 'শেকোয়া'য় আপন মনের প্রতিফলন দেখেছিলেন, তাই তাঁর অনুবাদ আক্ষরিক না হ'লেও আন্তরিকতায় উজ্জ্বল এং কাব্য-সৌন্দর্যে নবোদিত সূর্যের বর্ণবৈচিত্র্যের মতো। এর পর 'শেকোয়া'র তর্জমা অনেক হয়েছে – মুহম্মদ সুল্‌তান, মীজানুর রহ্‌মান, ডক্টর শহীদুল্লাহ্ এ-তিনজনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মীজানুর রহমান ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মূলকে যথাযথভাবে অনুসরণ ক'রেছেন; তাই তাঁদের রূপায়ণে ইক্‌বালের বক্তব্যের বিকৃতি ঘটেনি, কিন্তু কাব্যিক মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে। একে তাঁরা দোষের মনে করেননি, কেননা তাঁদের উদ্দেশ্য বাংলার পরিবেশে ইক্‌বালকে যথাযথভাবে পরিদৃশ্যমান করা, সুদৃশ্যভাবে নয়।

আমাদের ধর্মবোধের পোষকতা এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসার জন্য অনূদিত হয়েছে ইক্‌বালের আস্‌রারে খুদী ও রমুজে বেখুদী। উভয় গ্রন্থই নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্বসমন্বিত, নিশ্চিন্তে বোধগম্য নয়। আস্‌রারে খুদীর প্রথম বাংলা তর্জমা করেন সৈয়দ আবদুল মান্নান। অনুবাদটি জনপ্রিয়ও হয়েছে। আবদুল মান্নান গদ্যে তর্জমা করেছেন। এর পর আমি সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত কাব্যানুবাদ করেছিলাম। আমি মূলকে যথাযথভাবে অনুসরণ করিনি, শুধু মূলীভূত তত্ত্ব এবং আদর্শকে অক্ষুণ্ন চেয়েছি। ফর্‌রুখ আহমদও কাব্যে অংশবিশেষ অনুবাদ করেছেন।

এ ভাবে বিচিত্রভাবে বাংলা কবিতার আসরে আমরা ইক্‌বালকে পেয়েছি। বাংলার হাওয়ায় তাঁর গান ভেসেছে, বাংলার জলকল্লোলে তাঁর কণ্ঠ শুনেছি, তাঁর হৃদয়ের বিপুলতা দেখেছি বাংলার আকাশে। যেমন নবোদিত সূর্য সমুদ্রের দিগন্তে কাল্পনিক তটরেখা সৃষ্টি করে, যেমন মেঘের কৃষ্ণছায়া আকাশকে স্পর্শ করেছে বলে মনে হয়, তেমনি আমরাও মনে করছি যে, ইক্‌বালকে বোধের আয়ত্তে এনেছি; কিন্তু সমুদ্রের কল্লোলের যেমন পরিমাপ হয় না অথচ তা দেখে বিহবল ও আনন্দিত হওয়া যায়, তেমনি ইক্‌বালের গভীরতা, ব্যাপকতা ও বিপুলতা আয়ত্তাতীত কিন্তু আমাদের জন্য সংবেদনশীল ও আনন্দদীপ্ত।

সূত্রঃ প্যারাডাইজ লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত ইকবালের কবিতা গ্রন্থ

সৈয়দ আলী আহসান

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ইতিহাসবেত্তা ও শিল্প সচেতন ব্যক্তিত্ব সৈয়দ আলী আহসান ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ মার্চ যশোর জেলার মাগুরার (বর্তমান জেলা) আলোকদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বরেণ্য তাপস হযরত শাহ আলী বোগদাদীর বংশধর। সৈয়দ আলী আহসানের পূর্ব পুরুষেরা অনেকেই ধর্মপ্রাণ ও জ্ঞানবান মনীষী ছিলেন।

সৈয়দ আলী আহসানের শিক্ষা জীবনের শুরু ঢাকার ধামরাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। কিন্তু প্রকৃত পাঠচর্চা চলতে থাকে গৃহাঙ্গনে। গৃহ শিক্ষকের কাছ থেকে তিনি ফারসী, ইংরেজী, বাংলা ও গণিত শাস্ত্রে পাঠ গ্রহণ করতে থাকেন। ১৯৪০ সালে সৈয়দ আলী আহসানের বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শুরু হয়। ১৯৪৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী - ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ ডিগ্রী লাভ করেন।

তাঁর কর্মজীবন হুগলী ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক (১৯৪৫) হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। এরপর প্রোগ্রাম এ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে অল-ইন্ডিয়া রেডিও, ঢাকা রেডিও (১৯৪৭)। ১৯৪৯ সালে সাহিত্য কর্মের খ্যাতির জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি আন্তর্জাতিক পি. ই. এন. পাকিস্তান শাখার সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯৬০ সালে তিনি বাংলা একাডেমীর পরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে সৈয়দ আলী আহসান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে অংশ নেন এবং ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ আলী আহসান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। এ সময় তিনি "চেনাকণ্ঠ" ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও ধর্ম সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৭৫ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে নিয়েগ পান। সুইডেনের নোবেল কমিটির সাহিত্য শাখার উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি জাতীয় অধ্যাপক হিসাবে অভিষিক্ত হন এবং সে বছরই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। শেষ বয়সে দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে প্রফেসর হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে তিনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

আর্মানিটোলা বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় ১৯৩৭ সালে স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁর প্রথম একটি ইংরেজী কবিতা "The rose" প্রথম মুদ্রিত হয়। কবি মতিউল ইসলাম এ কবিতাটি বাঙলায় অনুবাদ করে □চাবুক□ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ম্যাট্রিক পড়ার সময় □আজাদ□ পত্রিকায় তাঁর দু□টি লেখা প্রকাশিত হয়। একটির শিরোনাম □হিন্দু-মুসলিম সমস্যা□ এবং অন্যটি □গণতন্ত্র ও ডিকটেটরশীপ।□

এই তরুণ বয়সেই সাহিত্য কর্মের জন্যে তৎকালীন বাংলা ভাষার খ্যাতিমান কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা গড়ে উঠে। এ সকল কবি সাহিত্যিকের মধ্যে কবি ফররুখ আহমদ, সিকান্দার আবুজাফর, শওকত ওসমান, বেগম সুফিয়া কামাল, হুমায়ুন কবীর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে পড়ার সময় সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় এবং কথা বলার অসাধারণ কলাকৌশলের জন্যে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় তিনি □প্রগতি সাহিত্য সংসদ□ ও রেডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি□র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৯৪০ থেকে ৪৪ এর মধ্যে তিনি গল্প লিখতে শুরু করেন। □মাসিক মোহাম্মদী□ এবং □সওগাত□ পত্রিকায় তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়। □বুদ্বুদ□, □তারা তিনজন□, □রহিমা□, □জন্মদিনে□ গল্পগুলি তাঁর অন্যতম। এ সময় তিনি □ইহাই স্বাভাবিক নামে একটি উপন্যাসও লিখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে গল্পচর্চা ছেড়ে শুরু করেন কবিতা চর্চা। সমালোচক হিসেবে তাঁর পদার্পণ ঘটে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের □পরিচয়□ পত্রিকায়, কবি সত্যেন্দ্রনাথ শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধটি মুদ্রিত হবার পর। এ সময়ে লেখা □রোহিনী□, □কবিতার বিষয়বস্তু□ ও □কালি কলমের প্রথম বর্ষ□ প্রবন্ধ তিনটি সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সৈয়দ আলী আহসানের সম্পাদনায় ১৯৫০ সালে শাহাদৎ হোসেনের কাব্য সংকলন □রূপছন্দা□ প্রকাশিত হয়। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে অংশ নেন- এ সময় তিনি □ইকবালের কবিতা□ সম্পাদনা করেন। ১৯৫৩ সালে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলল্লাহর সহযোগে □গল্পসঞ্চয়ন□ নামে একটি গল্প সংকলন সম্পাদনা করেন। ১৯৫৪ সালে □নজরুল ইসলাম□ নামক একটি সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯৫৬ সালে মুহম্মদ আবদুল হাই এর সহযোগিতায় □বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত□ গ্রন্থটি রচনা করেন। করাচী থাকাকালীন □কবি মধুসূদন□ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

সৈয়দ আলী আহসানের প্রতিভা বিভিন্নমুখী। প্রবন্ধলেখা ও সমালোচনায় তাঁর কৃতিত্ব তুলনাহীন। □কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা□ গ্রন্থে অসাধারণ দক্ষতায় প্রবন্ধ ও সমালোচনাকে তিনি সৃষ্টিশীল করে তুলেছেন।

তাঁর □অনেক আকাশ□, □একক সন্ধ্যায় বসন্ত□, □সহসা সচকিত□ এবং □আমার প্রতিদিনের শব্দ□ কাব্যগ্রন্থগুলো ঐতিহ্যানুরাগী সৌন্দর্যবোধ ও দেশপ্রীতির অনুপম নিদর্শন।

সৈয়দ আলী আহসানের চিত্রকলা, সঙ্গীত এবং অন্যান্য চারুকলার প্রতি আগ্রহ অপরিসীম। চিত্রকলার ইতিহাস ও চিত্রশিল্পের রসাস্বাদনে তিনি একজন নিবেদিত প্রাণ। চিত্রকলার অধ্যাপনায় তাঁর সাফল্য বিশেষ স্মরণীয়। ১৯৭০ সালে তাঁর □আধুনিক বাংলা কবিতাঃ শব্দের অনুষঙ্গে□ প্রকাশিত হয়।

১৯৭৩ সালে তাঁর সম্পাদিত মধ্যযুগের কাব্য □মধুমালতি□ প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থেও তাঁর পান্ডিত্যের পরিচয় রয়েছে। ১৯৪৭ সালে □রবীন্দ্রনাথঃ কাব্য বিচারে ভূমিকা□ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৯৭৬ সালে □জার্মান সাহিত্য; একটি নিদর্শন□ প্রকাশিত হয়।

১৯৮২ সালে "Approach" নামে একটি ইংরেজী ষান্মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৮৬ সালে তাঁর □আধুনিক কাব্য চৈতন্য এবং মোহাম্মদ মানিরুজ্জামানের কবিতা□ শীর্ষক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়।

এই জ্ঞানতাপস সৈয়দ আলী আহসান ২০০২ সালের ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার ঢাকার ধানমন্ডির কলাবাগানস্থ নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেন।